সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

Vol. 50 | No. 2-3 | 2013

Check for updates

জীবনানন্দ দাশের কাব্যচিন্তা

Volume	50
Issue	2-3
Year	2013
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	মাহবুবুল হক
Published online	June 1, 2013
DOI	10.62328/sp.v50i2-3.5
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v50i2-3.5
Pages	৭৯-৮৮
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

জীবনানন্দ দাশের কাব্যচিন্তা

Check for updates

মাহবুবুল হক*

এক

জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) এ যাবৎ প্রকাশিত প্রবন্ধসংখ্যা অর্ধশতাধিক[১]। গল্প ও উপন্যাস-রচয়িতা হিসেবে জীবনানন্দ দাশের কোন পরিচিতি জীবদ্দশায় না থাকলেও প্রাবন্ধিক হিসেবে তিনি পাঠক সমাজে একেবারে অপরিচিত ছিলেন না। তথাপি প্রাবন্ধিক হিসেবে তার স্বতন্ত্র পরিচয় গড়ে ওঠেনি। কারণ সর্বান্তঃকরণে কবি জীবনানন্দ দাশ প্রবন্ধ রচনায় ততটাই মনোনিবেশ করেছিলেন যতটা কবিতার সাথে বোঝাপড়ার জন্য তার প্রয়োজন ছিল। কবি হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধ-পাঠ থেকে উপলব্ধ হয় যে, এগুলো সময় ও সমাজের সাথে তাঁর কবিতাভাবনার মন্থনজাত চেতনামৃতরাশি; নিজেকে পরিপূর্ণ, আত্মসচেতন ও সৎ-সাহিত্যিক হিসাবে গড়ে তোলার প্রয়াস এবং 'কোনটাই বিষয় বিবরণের কারণে লেখা নয়, আত্মপ্রকটনের জরুরী স্বার্থে লেখা।' (জীবনানন্দ, ২০০০ : ভূমিকা)

বিষয়-বৈচিত্র্য বিচারে জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধের শ্রেণিকরণে সমালোচকদের মধ্যে বিভিন্নতা দেখা যায়।[২] তবে সামগ্রিক বিবেচনায় অনধিক পাঁচটি শ্রেণিতে জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধগুলোকে সাজানো যেতে পারে, যেমন—

ক. কাব্যচিন্তা বিষয়ক প্রবন্ধ
খ. সমকালীন সাহিত্য ও সাহিত্যিক সম্পর্কে প্রবন্ধ
গ. শিক্ষা ব্যবস্থা-বিষয়ক প্রবন্ধ
ঘ. স্মৃতিচারণমূলক রচনা
ঙ. গ্রন্থের ভূমিকা

তন্মধ্যে কাব্যচিন্তা বিষয়েই জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসংখ্যা অধিক যার মধ্যে পনেরটিই স্থান পেয়েছিল তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত *কবিতার কথা* (১৯৬২) গ্রন্থে। এর বাইরেও কয়েকটি প্রবন্ধে[৩] কবি তার স্বনির্মিত কাব্য বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার বর্ণনা দিয়েছেন। এমনকি কবির এই কাব্যজিজ্ঞাসা, তাঁর বেশ কিছু চিঠিপত্রেও পরিব্যাপ্ত[৪]। এ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয় যে, জীবনানন্দ দাশ রচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে সর্বাধিক বিস্তৃত ও আলোচিত বিষয় হল তাঁর কাব্যচিন্তা।

কবি কে, কবিতা কী, কিভাবে কবিতা রচিত হয়— এসব চিরায়ত জিজ্ঞাসার উত্তর সন্ধান করেছেন জীবনানন্দ দাশ তার প্রবন্ধে। পাঠক, বিশেষত কবিতা-পাঠক, সমালোচক সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা ও প্রত্যাশার যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্লেষণও প্রবন্ধগুলোকে সমৃদ্ধ করেছে। সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

মধ্যেই কবি যখন আত্মানুসন্ধানের অন্তর্তাগিদ অনুভব করেন তখন এই অনিবার্য প্রশ্নগুলোর মুখোমুখি তাকে হতে হয়, এমনকি সচেতন পাঠক-চিত্তও এ বিষয়ে আলোড়িত হতে পারে। সুতরাং 'এইসব জিজ্ঞাসা সম্পর্কে কবি ও পাঠকের ধারণা ক্রমশই আরো পরিচ্ছন্ন না হলে উভয় পক্ষই অস্বস্তি বোধ করবেন' (জীবনানন্দ, ১৯৯৫ : ৯৬)। তাই প্লেটো (Plato, আনু. ৪২৯-৩৪৭ খ্রি.পূ) থেকে জীবনানন্দ দাশ এবং অদ্যাবধি শিল্পবোধসম্পন্ন মানুষ মাত্রই এই অনিবার্য অনুসন্ধিৎসায় আলোড়িত হয়েছেন। অধিকন্তু, ধর্ম-বিজ্ঞান-ইতিহাস-দর্শনের সাথে কবিতা তথা শিল্পের সাযুজ্য-বৈপরীত্য, সম্পৃক্তি-সংঘর্ষ প্রাসঙ্গিকভাবেই এসব আলোচনায় অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। জীবনানন্দ দাশও সচেতনভাবেই বিষয়গুলোর সম্পর্ক বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্য সাহিত্যের ওপর ব্যাপক পঠন-পাঠনের কারণে তার চিন্তার ক্ষেত্রটি বিস্তৃত, সমকালস্পর্শী, কখনও প্রতিধ্বনিময় কিংবা অনুকারী। প্রবন্ধের তাত্ত্বিক আয়োজনকে মুখ্য না করে, স্বতোৎসারিত যুক্তি ও জিজ্ঞাসাপুঞ্জের অন্তর্বয়নে, অনধিক বাক্য বিন্যাসের আড়ম্বরহীনতায় নিজের কাব্যবিশ্বাসকে উপস্থাপন করেছেন জীবনানন্দ দাশ।

দুই

কবি ও কবিতা, কবিতা ও জীবন, জীবন ও সময় অবিভাজ্য। বিশ শতকের আধুনিক কবি একদিকে বিরূপ সময়কে আত্মস্থ করতে চাইলেন ঐতিহ্যের নবরূপায়ণের মধ্য দিয়ে। অন্যদিকে জীবনের বহুভঙ্গিম বাস্তবতা তাকে নিক্ষেপ করল অনিশ্চিত ও সংশয়াকুল সময়-গহ্বরে। ফলে অনিবার্যভাবে অসংলগ্ন, অসম্পূর্ণ এবং অমীমাংসিত জীবনের স্তরে স্তরে প্রকটিত হতে থাকল অতৃপ্তি। প্রকৃত কবির পক্ষে আত্মতৃপ্তি ক্ষতিকর অথচ মরীচিকার মতোই আরাধ্য। এই দ্বান্দ্বিকতায় প্রাণ পায় কবিতা। একে অনুভব করে সবাই, হৃদয়ঙ্গম করে অনেকে; প্রকাশক্ষম-প্রজ্ঞায় ধারণ করে স্বল্পসংখ্যক; প্রকাশের সার্থকতায় উদ্ভাসিত হয় কেউ কেউ। তাই, এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দ দাশের প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য :

> সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি; কবি— কেননা তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকীরণ তাদের সাহায্য করেছে। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৭)

কল্পনা ও অভিজ্ঞতার সাথে শতাব্দীপ্রাচীন কাব্যধারার সহায়তা হৃদয়ে ধারণ করেন কবি— জীবনানন্দ দাশের এ উচ্চারণে ইংরেজ কবি টি. এস. এলিয়টের চিন্তার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।[৫] প্রাচীন গ্রীক সাহিত্যতাত্ত্বিকদের ভাবনাও এতে অনুরণিত হয়। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ (১৩৯৭ : ৭) আরও অগ্রসর হয়ে যখন ব্যাখ্যা করেন—

> সাহায্য করছে; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয়; নানা রকম চরাচরের সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়।

তখনি কবি এক ভিন্ন জগতের নিঃসঙ্গপ্রায় গর্বিত অধিবাসী হয়ে পড়েন। এই ভিন্ন জগৎ, কবি যে সমাজের প্রতিনিধি, যে স্থান-কাল পরিপার্শ্বের প্রযত্নে লালিত, তা থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়। আবার এ নিঃসঙ্গতা একাকিত্বও নয়। জীবনানন্দ দাশ কবিতায় যেমন বলেন—

সকল লোকের মাঝে ব'সে
আমার নিজের মুদ্রাদোষে
আমি একা হতেছি আলাদা? ('বোধ', *ধূসর পাণ্ডুলিপি*)

এ জগৎ রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞেয় অদৃশ্যের সমীপবর্তী কিন্তু পরমত্বে আশ্রয় লাভের সুস্থিরতা সেখানে পাওয়া যায় না। কবিতার ভাব পুঞ্জীভূত হয় সেই জগতে,[৬] পাঠকের রসাস্বাদ হয় তদূর্ধ্বে উত্তরণের মাধ্যমে। লঙিনাস (Longinus, আনু, ২৮৬-২১৩ খ্রি.পূ.) যাকে 'মহত্ত্বব্যঞ্জক সমুন্নতি' (Sublimity) বলেছেন সে-পর্যায়ে কবি ও পাঠকের সমবায়ী অবগাহন কবিতাকে নির্মাণ করে। কিন্তু কবিতা প্রাণবীজ আহরণ করে ক্ষিতি-অপ-তেজ-ব্যোম-মরুৎ-সমষ্টির পৃথিবী থেকে, পৃথিবীর রূপ-রস গন্ধ থেকে। এক নাক্ষত্রিক বিশালতায় প্রতিস্থাপিত বস্তু-চেতনা, চেতনার বিচিত্র কুহক, জীবনের বর্ণ-বেশ-বঙ্কিমতা কবিতা-শরীরে অস্থি-মাংসের সন্ধান দেয়। তাই জীবনের সাথে কবিতাকে মিলিয়ে দেখেন জীবনানন্দ দাশ (১৩৯৭ : ১১১) :

> কবিতা এই পৃথিবীর এই জীবনের যত নিকটে, কোনো আলাদা জগৎ বলতে যা বোঝায় তার নিকটে ততটা নয়; কবিতা জীবনের থেকে কিছুটা দূরে—

ফলে, কবিতার সাথে জীবনের 'গোপনীয় সুড়ঙ্গলালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৪) স্থাপিত হয়। গোপনীয় অথচ সম্পূর্ণ— এই দ্বান্দ্বিকতার মধ্যেই পুষ্টি পায় কবিতা। জীবনানন্দ মনে করেন, কবিতাকে, কবিতার জগৎকে, পরিশুদ্ধ হয়ে আসতে হয় জীবনের মধ্য দিয়ে। তাই তার অমোঘ ভাষ্য 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ;' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৩)।

জীবনের সন্নিকটে লালিত কাব্যজগৎ কলাকৈবল্যের দূরবর্তী, উপযোগসূত্রের ঘনিষ্ঠ, কিন্তু শিল্পসুষমার অনাত্মীয় নয়। স্পর্শকাতর ভ্রূণের জন্য যেমন মাতৃজরায়ুর কোমলতা, উষ্ণতা, গ্রহণ-বর্জনের পরিমিতি আবশ্যক তেমনভাবে কবিতার জন্য প্রয়োজন সেই 'মহাভাবনা'র[৭], জগৎ-নির্মাণের প্রথম প্রস্তুতি সেখানেই সম্পন্ন হয়। এ জগৎকে সব কবিই চেনে, বিভিন্নভাবে চেনে; জীবনানন্দও চিনেছিলেন তাঁর নিজস্ব বিবেচনায়। তাই কবিতা কোথায় সৃষ্টি হয় এ প্রশ্নে জীবনানন্দের স্মরণীয় বর্ণনা :

> কবিতা রূপ পরিগ্রহ করে একটা অমেয় পরিধির ভিতর যেন— যাকে পাতালেও দেখা যায়, এবং নীলিমায়, কিন্তু প্রধানত এই পৃথিবীর ভিতর, জনসমাজে; (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৩২)

কবিতা কি? কাব্যতত্ত্বের ইতিহাসে এ-জিজ্ঞাসা প্রাচীনতম হলেও আজ অবধি অমীমাংসিত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যতাত্ত্বিকগণ এ প্রসঙ্গে বহুমাত্রিক ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ বা বিতর্ক উত্থাপন করলেও সৃষ্টিশীল কবিমনের সৃষ্টি-প্রক্রিয়াকে অবিকলভাবে উদ্ধার করতে সক্ষম হননি। এ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশের অভিমত উল্লেখযোগ্য। তিনি কবিতাকে 'স্বতন্ত্ররসাস্বাদ' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৪) সৌন্দর্যানুভূতি এবং সুসীম আনন্দের (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৫) স্তরে অবগাহনের মাধ্যম বলে মনে করেন। আনন্দের মধ্য দিয়ে কেউ, কেউ বেদনার নানা উদ্ঘাটনের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের প্রশান্তি সন্ধান করে। কবিতা, জীবনানন্দের ভাষায়, উভয়ক্ষেত্রেই 'তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়।'[৮]

তাই ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কিট্‌স্‌-এর কবিতার রসাস্বাদ এবং বোদলেয়ার, এলিয়টের কবিতার রসাস্বাদে বিস্তর তারতম্য সত্ত্বেও অন্তর্গত সুরসাম্যের দ্যোতনায় সৃষ্টি হয় অনশ্বর 'মনোমৈত্রী'। কবিতার ক্ষেত্রে সুরসাম্যের গুরুত্বের কথা জীবনানন্দ দাশ বারবার বলেছেন। একাধিক প্রবন্ধ ছাড়াও, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পত্রেও তিনি উল্লেখ করেছেন — 'সকল বৈচিত্র্যের মতো সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর'। (জীবনানন্দ, ১৩৮৪ : ৩১)

শিল্পের অবয়ব-সংগঠনের সাথে যেমন জৈবিক অঙ্গসংস্থানের সৌষম্য তুলনীয়, তেমনভাবে কবিহৃদয়ে অনুরণিত সুর এবং বস্তু পৃথিবীর সাথে তার সুসমঞ্জস একাত্মতার ফলে কবিতা সৃষ্ট হয়। জীবনানন্দ দাশের অননুকরণীয় বর্ণনায় :

> এই সবের অপরূপ উদগীরণের ভিতর এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তু-সঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতরে; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয়; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর তাদের একাত্মতা ঘটে— কাব্য জন্ম লাভ করে। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৪)

'কবিতার আত্মা ও শরীর' শীর্ষক প্রবন্ধে জীবনানন্দ দাশ উল্লিখিত বিষয়ের আরও বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন :

> যে কোনো সময়ের যে কোনো জগতের সত্য অভিজ্ঞতা কোনো এক বিশেষ আধারে অন্তঃপ্রবেশ লাভ করে যখন চিত্রস্তনিত ধ্বনির পবিত্র মর্মস্পর্শিতায় ফুটে উঠতে থাকে, তখন বুঝতে হবে যে, সে আধার সক্রিয় কবিমন— কবিতা সৃষ্টি হচ্ছে। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৪)

কবিতা-জন্মমুহূর্তে কবিচিত্তের আয়োজন সম্পর্কে এ এক অমোঘ উচ্চারণ। কবির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার জগতে প্রতিনিয়ত সঞ্চরণশীল বিচিত্র উপকরণ থেকে নির্বাচনের দায়িত্বে অভিনিবিষ্ট থাকে সক্রিয় কবিমন। এক্ষেত্রে কবি-স্বভাব ও কবি-ব্যক্তিত্বের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ অনস্বীকার্য। দুয়ের বিচ্ছুরণে আলোকিত হয় কবিতা। চেতনা আর শিক্ষার প্রভায় আলোকিত হতে পারে কবি-স্বভাব তবে জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতার গভীরতায় কবি প্রতিভা সবসময় উজ্জ্বলতর হয় না। বরং কবি-মন কবি-স্বভাবে দুর্বল হয়ে যেতে পারে যদি-না দ্যুতিময় উজ্জীবিত কবি-স্বভাব অভিজ্ঞতার সারাৎসার বহন করে কবির 'অন্তঃকরণে দিব্যতা' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১০৬) নিয়ে আসে। সহজাত গুণসিদ্ধ স্বভাব-কবিত্ব কিংবা সহজ-কবিত্ব মহৎ কবিতা সৃষ্টির অন্যতম অনুঘটক। কিন্তু ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যের ওপর নির্ভর করে উত্তীর্ণ হতে হয় তাকে। ব্যক্তিত্বের বিভিন্নতার কারণে কবিতা অনেকরকম হয় :

> কবিদের ব্যক্তিত্বের উচ্চ-নীচ পার্থক্য অনুসারে একই রকম এবং একই সংখ্যার অভিজ্ঞতার এরকম বিভিন্ন ব্যবহার হয় যার ফলে এর কবিতাকে চলনসই মনে হয়, ওর কবিতাকে সুন্দর, তার কবিতাকে সৎ, আর একজনের কবিতাকে মহৎ; এত পৃথক তাৎপর্য ও প্রতিভার কবিতা সৃষ্ট হয়। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১০৯)

ব্যক্তিত্বের স্তরভেদে সঞ্চিত হয় কবির জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার নির্যাস। সঞ্চিত অভিজ্ঞতার যুগোপযোগী সত্যমূল্য নির্ধারণের দায়িত্বও কবির। তারপরও কবিস্বভাব ছাড়া লব্ধ-জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা কবিতায় রূপ লাভ করতে পারে না বলে জীবনানন্দের অভিমত। এতসব প্রস্তুতি

ও প্রভাব সত্ত্বেও কবির 'ইমাজিনেশন' তথা কল্পনাপ্রতিভা বা ভাবপ্রতিভা ছাড়া কবিতা সার্থক হয়ে ওঠে না। এ সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের ভাষ্য উল্লেখ করা যেতে পারে—

> কবিতা রচনার পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে বলতে পারা যায় এই : যখনই 'ভাবাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোশাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি— একই এবং বিভিন্ন সময়ে। অন্তঃপ্রেরণা আমি স্বীকার করি। কবিতা লিখতে হলে ইমাজিনেশনের দরকার; এর অনুশীলনের। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৪২)

এখানে দুটি বিষয় পরস্পর পরিপূরক— প্রেরণা এবং কল্পনাশক্তি। কল্পনা বা ভাবপ্রতিভাকে কবির 'সকর্মক শক্তি'[৯] হিসেবে ধরে নিলে, প্রেরণাকে বলতে হয় সেই শক্তির উৎস বা জ্বালানি। গ্রিক দার্শনিক ও মনীষী প্লেটো কাব্য রচনায় প্রেরণার কথা সর্বপ্রথম উল্লেখ করলেও তাতে কবির চেয়ে ঈশ্বরের অবদানই বেশি। একদিকে কল্পনা অন্যদিকে প্রেরণা— এ দুয়ের যুগলবন্দি কবি-প্রতিভা। আধুনিক কবি ও প্রাবন্ধিক হিসেবে জীবনানন্দ দাশ আরও স্পষ্ট ও যুগোপযোগী ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা উল্লেখযোগ্য :

> নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়— আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন— এবং সেসবের সম্মিলিত সম্বন্ধ-শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়। ...কবিমানসের আবেগ ও প্রজ্ঞার মিলন ঘটিয়ে মানুষের আবহমান অভিজ্ঞতাকে আরো ঠিকভাবে বুঝবার সুযোগ দেয় এই প্রেরণা। প্রেরণার উৎস অবশ্য নানা দিক দিয়ে নানা ধারায় এসে উপস্থিত হয়। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৪৫)

সুতরাং আধুনিক কবির প্রেরণায় মন্ময়তার চেয়ে মননশীলতাই বেশি। তিনি প্রেরণা লাভ করেন সমাজবীক্ষা ও বিশ্ববীক্ষা থেকে, যুগের প্রবণতা ও প্রচলন থেকে; পরিবর্তনশীল পরিপার্শ্বের নানা উৎস থেকে— কোথা থেকে নয়। তথাপি এ কথা সত্য, প্রেরণার উৎস অনিঃশেষ হলেও কবিমানসে এর প্রবাহ অন্তহীন নয়। 'প্রেরণাতে অলৌকিকের আভাস' পেয়ে একে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ প্রেরণা-কল্পনা-ভাবজাতীয় বিজ্ঞান-সূত্র-বর্জিত শব্দপুঞ্জে আস্থা রাখলেন। কারণ, তিনি বিশ্বাস করেন "মেকানিক্যালি' মহৎ কবিতা লেখা সম্ভব নয়।' (জীবনানন্দ, ১৩৮৪ : ৪৮) প্রেরণা-কল্পনা-মনীষাজারিত প্রতিভার পক্ষেই সম্ভব কবিতা রচনা করা। এ যুগে প্রতিভা যতটা জন্মগত তার চেয়ে অধিক অনুশীলনজাত এবং চর্চিত। নিজস্ব প্রতিভার ক্ষেত্রেই সে সিদ্ধ ও ঋদ্ধ— অন্যত্র নয়। তবে প্রতিভার প্রকীর্তি সময়ের আনুকূল্য পাবে একথা নির্দ্বিধায় বলা যায় না। যেমন, কবির কবিতা ঠিক কোন কালের পাঠককে আলোড়িত করবে তা অনুমান করা দুরূহ। কিন্তু 'তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৮) বিশ্বস্ত থাকতে হবে এজন্য যে, অপচয়িত প্রতিভার কোনো মূল্য নেই পৃথিবী বা সময়ের কাছে। প্রতিভা সম্পর্কে তার সবচেয়ে মৌলিক চিন্তার প্রতিফলন পাওয়া যায় যখন বহুমাত্রিক প্রতিভাধর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রভাব বলয়ের বিপরীতে যুগমানসের প্রবণতাকে চিহ্নিত করে জীবনানন্দ দাশ বলেন— 'এ যুগ অনেক লেখকের— একজনের নয়— কয়েকজন কবির যুগ' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৪০)। প্রতিভা, কল্পনা এবং প্রেরণা— এই তিন শক্তি নিয়ে ব্যক্তি কবি হয়ে ওঠে। তবে, 'তাকে সংস্কারমুক্ত শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হওয়া চাই।' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৪২)

তিন

ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সময় পরস্পরবিচ্ছিন্ন নয়। ইতিহাস রূপ পরিগ্রহ করে, ঐতিহ্যের স্ফটিক খণ্ডে। সেখান থেকে বিচ্ছুরিত হয় সময়ের বর্ণচ্ছটা। ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের মর্মে সময়ের ঘণ্টাধ্বনি শোনা যায় নিরন্তর। কবির ঐতিহ্য এবং ইতিহাসচেতনা যুগদর্শনজাত। কবির অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান, কবিস্বভাবের সংস্কার-বিশ্বাস ইতিহাস থেকে আহৃত এবং ঐতিহ্যের প্রযত্নে সমৃদ্ধ। সেটা সব কালের কবির জন্যই প্রযোজ্য। প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর কাব্যজগতে পাউন্ড-এলিয়টের চিন্তার অনুরণন বাংলা কবিতায় প্রভাব বিস্তার করে ত্রিশের দশকে এসে। বিশেষত ঐতিহ্য, ঐতিহ্যের অনুবর্তন ও পরিগ্রহণ সম্পর্কে এলিয়টের ভাবনা কবির শ্রম ও মেধাকে প্রাধান্য দেয়। ঐতিহ্য অনড় বা অপরিবর্তনশীল নয়; আবার, প্রজ্ঞাহীন ঐতিহ্য কখনও সমৃদ্ধ নয়; কারণ একসময় যা বিশ্বাস অন্যসময় তা পরিণত হতে পারে কুসংস্কারে – এলিয়টের মতো এমন বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন জীবনানন্দও। প্রায় একই সময়ে জীবনানন্দ দাশের কবি-মানসও হয়ে ওঠে ঐতিহ্যানুরাগী – এলিয়ট পাঠের আগেই; যুগস্বভাব ও 'পরিবর্তনের আবেগ অনুভব' করে।[১০] তবে তিনি মনে করেন –

> ঐতিহ্যকে সাহিত্যে বা কবিতায় রূপায়িত করতে হলে ভাব-প্রতিভার প্রয়োজন – যা প্রজ্ঞাকে স্বীকার করে নিয়ে নানা রকম ছন্দে অভিব্যক্ত হয়। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৩৩)

বলা বাহুল্য, এ ঐতিহ্য বিশ্ব-কবিতার ঐতিহ্য। পরিগ্রহণে কুণ্ঠিত হবেন না আধুনিক কবি, যদি তা কেবল আহরণের কৃতিত্বে সীমাবদ্ধ না থেকে পুনর্নির্মাণের সৃষ্টিশীলতায় পরিণতি লাভ করে। ঐতিহ্যের সাথে ইতিহাসচেতনা নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কিত। বর্তমান অন্তর্হিত হয় অতীতে, অতীত প্রাণ পায় ইতিহাসচেতনায়; ইতিহাস পুনরুজ্জীবিত হয় ঐতিহ্যের পুনরাবর্তনে। জীবনানন্দ দাশের তাৎপর্যপূর্ণ ভাষ্য :

> কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৩৩)

জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা 'তত্ত্বমুখর নয় অনুভূতিনির্ভর, যুক্তিসাপেক্ষ নয় বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত' (অমলেন্দু, ১৯৮৪ : ২৭৫) যার অনন্য উদাহরণ পাওয়া যায় কবিতায়, 'যেখানে ইতিহাস কেবল বর্তমানে এসে মেশেনি, ভবিষ্যতের উদ্দেশে রওনা হ'য়ে গেছে।' (মান্নান সৈয়দ, ১৯৯৪ : ৭৫০)

সময়, ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের কাছে কবির ঋণ অপরিমেয়। জীবনানন্দ-মানস এক্ষেত্রে ইয়েটস্, এলিয়টের খুব কাছাকাছি, নিকটবর্তী যুগমানসেরও। যুদ্ধোত্তর বিপর্যস্ত মানুষের কাছেই ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের মধ্যে অবগাহন প্রাণসঞ্চারী হয়ে ওঠে; যখন সামনে থাকে আবিল আগামী, ধূসর মহাকাল, পোড়ো জমি। চরাচরে ব্যাপ্ত কবি-হৃদয় সত্যসন্ধানী হয়ে ওঠে মানবতা ও মানবিকতার প্রদীপ্ত আলোর প্রক্ষেপণে। অর্থাৎ কল্পনার বিস্তারে, প্রেরণার উত্তুঙ্গ শিহরনে কবি যতই মোহাবিষ্ট হোন না কেন, জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার উৎকর্ষে যতই স্বায়ত্ত হোন না কেন, সময়-ইতিহাস-ঐতিহ্যের সমবায়ী অংশগ্রহণের প্রশ্নে কবি-চিত্ত নিরঙ্কুশ স্বাধীন নয়। কারণ,

> যে সময়ে সে বাস করছে এবং যে সময়ে সে বাস করেনি, যে সমাজে সে কাল কাটাচ্ছে এবং যেখানে কাটায়নি, যে ঐতিহ্যে সে আছে, এবং যেখানে সে নেই – এই সকলের কাছেই সে ঋণী। (জীবনানন্দ. ১৩৯৭ : ২৯)

চার

ধর্ম, বিজ্ঞান ও দর্শনের সাথে কবিতার সম্পর্ক ও দূরত্ব কিংবা সম্পর্কের ভিত্তি বিশ্লেষণ করেছেন জীবনানন্দ দাশ। ধর্মের সত্যের ভিত্তিতে আছে বিশ্বাস, বিজ্ঞানের সত্যের ভিত্তি প্রমাণ আর দর্শনের সত্যে যুক্তি। তাহলে, কবিতার সত্য কোন বিষয়ের ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে? এ প্রশ্নের একেবারে স্বকৃত সমাধান দিয়েছেন জীবনানন্দ। তাঁর বর্ণনায়–

> কাব্য সৃষ্টির সময় বিজ্ঞান ও দর্শন নিজেদের মোটামুটি সত্যে আছে কবির হৃদয়ে, সেখান থেকে কাব্যের সত্যে একটা তারণ স্পর্শের ফলে ক্রমেই উত্তীর্ণ হচ্ছে। কবিতা লেখবার সময় বোঝা যায় হৃদয় কেমন মিতব্যয়ী কবির – প্রয়োজনীয় ছাড়া বাকি সব উপকরণ বাতিল করেছে। জ্ঞান যা দান করে কবির হৃদয় সেই সব উপলব্ধির আকর; (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৮৭)

অর্থাৎ কবিতার সত্য বিজ্ঞান ও দর্শনের সত্যের সমন্বয়। কবিতা যে জীবনকে উদ্ঘাটন করে, কবি ও পাঠকের কল্পনার যে সুষমা দান করে কিংবা উভয়কে যে সত্যের স্তরে উন্নীত করে তা বিজ্ঞানের সত্যের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। কারণ সত্য সকল স্তরেই অব্যর্থ, সকল বিভিন্নতায় সত্য। পার্থক্য কেবল 'কবিতাটিকে প্রমাণ করবার জন্যে কোনো গাণিতিক যুক্তি নেই – গ্রহণ করবার জন্যে মানুষের মন বা হৃদয় রয়েছে;' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৮৮) এ বক্তব্য ধর্মের সমীপবর্তী, কিন্তু ধর্ম ও কবিতাকে একাত্ম করতে হলে দর্শন ও বিজ্ঞানকে নির্বাসন দিতে হয় অথচ আধুনিক কবিতা প্রাণরস সংগ্রহ করে বিজ্ঞানের ভেতর থেকে, ধর্মের 'আপ্ত বাক্যের কোনো স্থান নেই কবিতায়' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৮৯)। সুতরাং দেখা যাচ্ছে একসময় যে ধর্ম বা দর্শন ছিলো মানব-চিত্তের আশ্রয় তা ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানের নিয়ন্ত্রণে চলে গেছে। এমনকি ধর্ম ও দর্শনের অনেক ক্ষেত্রই বিজ্ঞানে স্বচ্ছন্দ ও সহজবোধ্য বলে মনে হচ্ছে কিন্তু তদুপরি সব সত্যকেই বিজ্ঞান ধারণ করতে পারে এমন মনে করেন না জীবনানন্দ নিজেও। তাই 'ভালো কবিতা বা মহৎ কবিতা – কোনো স্পষ্ট, বিজ্ঞান-প্রামাণ্য পথে রচিত হয় বলে' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৮৬) তিনি মনে করেন না। তাহলে, মহৎ-কবিতা বা মহৎ-কবির সার্থকতা কোথায় এমন অনিবার্য প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়। জীবনানন্দ দাশ (১৯৯৫ : ৯৬) নিজেও এর ব্যাখ্যা স্থাপনের চেষ্টা করেছেন :

> মহৎ কবির ভাবনা সূক্ষ্ম, হৃদয় আন্তরিক (আশা করা যেতে পারে), অভিজ্ঞতা সজাগ, ও চেতনা অবচেতনা ঐকান্তিকভাবে সক্রিয়।

অপরপক্ষে, সেই কবিতাকে জীবনানন্দ (১৯৯৫ : ৯৬) মহৎ কবিতা বলেন যা –

> আমাদের জ্ঞানপিপাসু স্বভাবকে সর্বতোভাবে সব কথা জানিয়ে দেবার চেষ্টা করে; আমাদের ভাবনাকে সর্বমানবীয় পরিসর দেয়; অভিজ্ঞতার আত্মপ্রসাদের ভিতর আত্মনাশ ও সকলের সর্বনাশ রয়েছে জানিয়ে দিয়ে তাকে মহত্তরভাবে গ্লানিহীন করে দিতে চায়; হৃদয়কে ক্রমশই বিশুদ্ধ করে।

পাঁচ

কবি-কবিতা-পাঠক একটি ত্রিভূজ সম্বন্ধসূত্রে সংগ্রথিত। কবির চৈতন্য ও উপলব্ধির সাথে পাঠকের মনন ও জিজ্ঞাসার যোগসূত্র স্থাপিত হয় কবিতার মাধ্যমে। কবিতার মাধ্যমে কবি পাঠককে – এক আনন্দের স্তরে আহ্বান করেন যাতে পৌঁছতে হয় সৌন্দর্যের পথ ধরে, পাঠক তাতে সাড়া দিয়ে থাকেন। কিন্তু বলা যায় অধিকাংশ পাঠকই সে জগতে উন্নীত হতে পারেন না। যারা উন্নীত হন তারাও যে ঠিক অভিন্ন রসাস্বাদন করেন তা-ও বলা যায় না কারণ 'কবিতা পাঠ হচ্ছে একটি স্বতন্ত্র রসাস্বাদ' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৪)। তাই পাঠক ও সমালোচক সম্পর্কেও জীবননান্দ দাশ তার মৌলিক চিন্তার স্বাক্ষর রেখেছেন :

> আরো কিছু সুস্থির ও তদ্‌গত না হলে শাদামাঠা কবিতা পড়েও স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন। কবিতা আরো সৎ হলে পাঠকের কাছ থেকে সুস্থিরতা ও নিবেশের দাবিই করবে না শুধু, পাঠকের অভিজ্ঞতা ও তার মূল্য সম্বন্ধে চেতনা কি রকম বুঝে দেখবে। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৬৫)

কবিতা-পাঠক সম্পর্কে সর্বদা সচেতন জীবনানন্দ দাশ পাঠকের মনশ্চক্ষু উন্মীলনের জন্য পাঠাভ্যাস অপরিহার্য মনে করেন। বাংলা কবিতার পাঠক মহল তার নানা চিন্তনের মধ্যে গুরুত্ব পেয়েছে। তবে পাঠকের মধ্যেও এক 'মহাপাঠক' সমাজ গড়ার আকাঙ্ক্ষা, কবি হিসেবে নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায় অনেক পাঠককে পরিদীক্ষিত করতে পারার অভীপ্সা জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন কবিতার প্রকৃত আশ্রয় পাঠকের হৃদয়। এ প্রসঙ্গে জীবনানন্দের আধুনিক মনন-জারিত বিশ্লেষণ স্মরণীয়:

> কোনো একটি অনশ্বর কবিতা প্রচুর অভিজ্ঞতা দাবি করে পাঠকের কাছ থেকে ; ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছনো দরকার। একবার পৌঁছতে পারলে পাঠকের মনের নমনীয়তার আধেয় হিসাবে থাকবে সে। কবিতাটির ভিন্ন ভিন্ন মানে বেরুবে একজন ও বিভিন্ন পাঠকের অর্থকৃৎ মনের বিভিন্ন রকমের আলোকিত অবস্থায়। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৬৬)

আধুনিককালে সার্থক কবিতার অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে পাঠকের অংশগ্রহণকে সমান গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হয়। এ বিষয়ে জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন বলেই উপলব্ধি করেছিলেন যে, ততখানি ঋদ্ধ পাঠক পেতে হলে 'ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১৬)। এই পরিবর্তন আনার দায়িত্ব কবির, তবে তা 'সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির' পরেই সম্ভব। এভাবে রুচি, শিক্ষাদীক্ষা এবং সমাজপরিবর্তনের সূত্র ধরে পরিবর্তিত পাঠক চিনে নিতে পারবে খারাপ কবিতা বা ভালো কবিতা, পৌঁছে যাবে সিদ্ধান্তের ক্রমিক নির্মলতায়। (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৬৬)

কবি-কবিতা-পাঠক সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশ স্বনির্মিত বিশ্বাস ও আকাঙ্ক্ষার কথা লিখেছেন। নন্দনতাত্ত্বিক তিনি নন। কিন্তু কবি ও কবিতা নিয়ে সুপ্রাচীন ও বহুল আলোচিত জিজ্ঞাসা তাকেও আলোড়িত করেছিল। 'কাব্যের ইন্‌টিগ্রিটি' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ১০) অন্বেষার প্রশ্নে তিনিও অনুসন্ধানী — তাত্ত্বিক হিসেবে নয়, কবি হিসেবে। তথাপি তাঁর কাব্যদর্শনের গদ্যভাষ্যে কবির আবেগ বা রহস্যময়তা নেই; নেই সিদ্ধান্তের পরস্পর বিরোধিতা বা আত্মবিশ্বাসের শৈথিল্য। আমৃত্যু 'প্রতিভা বিশ্বস্ত'-কবি নন্দনচিন্তায়ও

বিস্ময়কর আধুনিকমনস্কতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি প্রধানত পাশ্চাত্য কাব্যতাত্ত্বিকদের বিশ্লেষণকে গ্রহণ করলেও স্বকীয় কাব্যভাবনাকে সংগ্রথিত করে এবং নন্দনতত্ত্বের অনালোকিত প্রকোষ্ঠে ক্ষেত্রবিশেষে মৌলিক চিন্তার প্রক্ষেপণের মাধ্যমে এক স্বতন্ত্র কাব্যবিশ্বাসের জগৎ নির্মাণ করেছেন। ফলে, কবি জীবনানন্দ দাশ তিরোহিত হয়ে এখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যুগোপযোগী কাব্যতত্ত্বের এক অনন্য বিশ্লেষক যার অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান-বিশোধিত নগ্ন-শুদ্ধ আত্মা দেশ-কাল-সন্ততির মধ্যে প্রসৃত।

টীকা

১. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের (২০০০) সম্পাদনায় ষাটটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে তন্মধ্যে ইংরেজিতে রচনা রয়েছে বারোটি। ফয়জুল লতিফ চৌধুরীর সম্পাদনায় (১৯৯৫) সংকলিত হয়েছে সর্বমোট পঁয়তাল্লিশটি প্রবন্ধ। তন্মধ্যে ইংরেজিতে রচনা আছে দুটি।
বর্তমান নিবন্ধে ইংরেজি প্রবন্ধগুলো বিবেচনায় নেয়া হয়নি।

২. দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০ : ভূমিকা) জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমূহকে নিম্নলিখিত পাঁচটি শ্রেণিতে সাজিয়েছেন —
ক. সাহিত্য সমাজ শিক্ষা
খ. গ্রন্থভূমিকা ও গ্রন্থালোচনা
গ. খসড়া নিবন্ধ
ঘ. আত্মপ্রসঙ্গ
ঙ. স্মৃতিনিবন্ধ
আবদুল মান্নান সৈয়দ (জীবনানন্দ ১৩৮৪) জীবনানন্দের গদ্য রচনাগুচ্ছকে সাতটি শ্রেণিতে বিন্যস্ত করেছেন যা নিম্নরূপ —
ক. স্মৃতি ও শ্রদ্ধার্ঘ রচনা
খ. কবিতা ও উপন্যাস, কবি ও ঔপন্যাসিক বিষয়ে আলোচনা
গ. গ্রন্থালোচনা
ঘ. শিক্ষা প্রাসঙ্গিক সন্দর্ভ
ঙ. সামাজিক সন্দর্ভ
চ. গ্রন্থের ভূমিকা – নিজের ও অন্যদের
ছ. তার্কিক রচনা

৩. এ প্রসঙ্গে 'কেন লিখি' (কোলকাতার 'ফ্যাসিস্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী' প্রকাশিত পুস্তিকায় ১৯৪৪ সালের জানুয়ারিতে প্রথম প্রকাশিত) এবং 'লেখার কথা' (প্রথম প্রকাশ 'ময়ুখ' আষাঢ়-শ্রাবণ সংখ্যা, ১৩৬৫) প্রবন্ধ দুটি উল্লেখযোগ্য।

৪. জীবনানন্দ দাশ লিখিত এ যাবৎ উদ্ধারকৃত চিঠিপত্রের সংখ্যা শতাধিক; প্রভাতকুমার দাস-কে উদ্ধৃত করে এ তথ্য জানিয়েছেন আবুল আহসান চৌধুরী (১৯৯৯ : ৪৯৬)। এছাড়া দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় (২০০০) সম্পাদিত গ্রন্থে বাষট্টিটি পত্র সংকলিত হয়েছে। এ যাবৎ প্রাপ্ত চিঠিপত্রের অন্তত সাতটিতে জীবনানন্দ দাশ তার কাব্যচিন্তা নিয়ে প্রাপকের সাথে মতবিনিময় করেছেন প্রমাণ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে অজ্ঞাতনামা প্রাপকের উদ্দেশ্যে লিখিত তিনটি পত্রে তার কাব্যচিন্তার জোরালো ভিত্তি রয়েছে যা পরবর্তীকালে কবি নিজেই প্রবন্ধাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন।

৫. বিস্তারিত— দীপ্তি ত্রিপাঠী (১৯৯২ : ৩৩, ৪৬-৪৭, ১১৭, ১৫০-১৫১)।

৬. এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার গুপ্তকে লেখা জীবনানন্দ দাশের পত্রের উদ্ধৃতি প্রযোজ্য :
'আমাদের এই পৃথিবীর ভেতরেই আরও অনেক পৃথিবী রয়েছে যেন। সাধারণ চোখ দিয়ে স্বভাবত তা খুঁজে পাওয়া যাবে এমন নয়। থাকে তা সৃষ্টিপরায়ণ মানসের ভিতর; এরাই আমাদের দেখান।' (জীবনানন্দ, ১৩৮৪ : ৪২)

৭. 'মহা' উপসর্গযোগে জীবনানন্দ দাশ আরও কয়েকটি শব্দ ব্যবহার করেছেন যা মূলশব্দের সাথে অভূতপূর্ব ব্যঞ্জনা সংযোজন করেছে। যেমন— মহাইতিহাস, মহাপাঠক, মহাসময়, মহাজিজ্ঞাসা, মহাকবিতা।

৮. বিস্তৃত উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :
'যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে – মানবকে ফলিয়ে তুলে–তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায় – যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে, সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে – তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়; মহাসময়ের ভিতর দিয়ে চলতে-চলতে শতছিন্ন অন্তরিন্দ্রিয়কে আবার ছেদ করে এ এক মনোমৈত্রী।' (জীবনানন্দ, ১৩৯৭ : ৩০)

৯. বিস্তৃত উদ্ধৃতি নিম্নরূপ :
'সৃষ্টি ক্রিয়াকালে একটা প্রচণ্ড সকর্মক শক্তির চাপে (এই শক্তিকেই ইংরেজিতে ইম্যাজিনেশন, সংস্কৃতে প্রতিভা বলা হয়েছে) প্রবৃত্তিগুলি সংযত সুশৃঙ্খল হ'য়ে যায়, কল্পনার নীহারিকাপুঞ্জ সুঠামরূপ গ্রহণ করে। বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খলায়, নীহারিকা থেকে গ্রহরূপে, বিমূর্ত থেকে মূর্তিতে, অশান্তি থেকে প্রশান্তিতে এই যে রূপায়ণ তারই উপলব্ধি হচ্ছে শিল্পের আনন্দ।' (অমলেন্দু, ১৯৮৪ : ২৭১)

১০. এ প্রসঙ্গে দীপ্তি ত্রিপাঠীর ভাষ্য উল্লেখযোগ্য – 'এলিয়টের কাব্য পূর্বে দু-একজন কবি প'ড়ে থাকলেও বাংলা দেশে তার ব্যাপক প্রভাব শুরু হ'ল ১৯৩০ সাল থেকে। আমাদের আধুনিক কবিরা কিন্তু ইতিপূর্বেই দু-একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন, যথা— সুধীন্দ্রনাথের 'তন্বী', বুদ্ধদেব বসুর 'মর্ম্মবাণী' ও 'বন্দীর বন্দনা', জীবনানন্দ দাশের 'ঝরা পালক' ও 'ধুসর পাণ্ডুলিপি, ইত্যাদি। সুতরাং এলিয়টকে অবলম্বন ক'রেই যে আধুনিক বাংলা কাব্যের আন্দোলন শুরু হয়নি এ-কথা সুনিশ্চিত। তাঁরা নিজেদের মধ্যেই একটা পরিবর্তনের আবেগ অনুভব করছিলেন।' (দীপ্তি ১৯৯২ : ৩৬)

গ্রন্থপঞ্জি

আব্দুল মান্নান সৈয়দ, (সম্পাদিত) ১৯৮৪। *জীবনানন্দ*, চারিত্র্য, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ১৩৮৪। *জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, মুক্তধারা, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ১৩৯৭। *কবিতার কথা*, সিগনেট প্রেস, কলকাতা।

জীবনানন্দ দাশ, ১৯৯৪। *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতাসমগ্র*, আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, অবসর, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ১৯৯৫। *জীবনানন্দ দাশের প্রবন্ধসমগ্র*, ফয়জুল লতিফ চৌধুরী সম্পাদিত, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা।

জীবনানন্দ দাশ, ২০০০। *জীবনানন্দ দাশ রচনাবলী*, চতুর্থ খণ্ড, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত (জন্মশতবর্ষ সংস্করণ), গতিধারা, ঢাকা।

দীপ্তি ত্রিপাঠী, ১৯৯২, *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়*, দে'জ পাবলিশিং, কলিকাতা।

প্রবন্ধপঞ্জি

অমলেন্দু বসু, ১৯৮৪। 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা', *জীবনানন্দ* [আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত], চারিত্র্য, ঢাকা।

আবদুল মান্নান সৈয়দ, ১৯৯৪। 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা : একটি পরিক্রমা', পরিশেষ-১২, *প্রকাশিত-অপ্রকাশিত কবিতা সমগ্র* [আব্দুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত], অবসর, ঢাকা।

আবুল আহসান চৌধুরী, ১৯৯৯। 'জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত পত্রাবলী এবং প্রসঙ্গত', *উত্তরাধিকার*, সংখ্যা : এপ্রিল-ডিসেম্বর, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।